অশোকের সঙ্গও কম প্রাপ্তি নয়

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

অনেকের মতো, আমিও অনেকদিন আগেই জানতাম যে, অশোক অকালে চলে যাবে। অসুস্থ ছিল, সবরকম নিয়ম মেনে চলত। তবু সে চলে যাবে— জানতাম। কিন্তু সত্যি সত্যিই যখন তার মৃত্যু-সংবাদ এল, তারও আগে তার জীবন্মৃত হয়ে থাকার সংবাদ (দেখা করারও আর কোনো অবস্থা রইল না), বন্ধুর মৃত্যুতে যেমন হয়, হঠাৎ ক'রে থেমে যাবার একটা অনুভূতি— সেই অনুভূতিই প্রধান হয়ে এল। এতদিন ধরে যা যা ভাবতাম, তা কোনো কাজেই লাগল না।

অশোকের সঙ্গে পরিচয় আমার সহপাঠী ও দীর্ঘদিনের বন্ধু সন্দীপের মাধ্যমে। সেটা আশির দশকের প্রথম দিকে। কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে সন্দীপের সঙ্গে দেখা করার কথা। সেখানে অশোকও ছিল। আমি বরাবরই 'বিজ্ঞানের লোকেদের একটু ভয় পাই। তাদের অর্ধেক কথা বা লেখা বুঝতে পারি না। জিজ্ঞেস করে দেখেছি, তাতে বিষয়টা তাঁরা আরও জটিল করে তোলেন। আমার মতো 'গোলা' মানুষদের বোঝাবার জন্য যে ভাষা ও পাণ্ডিত্যের যে গভীরতা থাকার দরকার, অধিকাংশ 'বিজ্ঞান'-এর মানুষের তা নেই, বলতে বাধ্য হচ্ছি।

আলাপ করিয়ে দিয়ে সন্দীপ স্বভাবতই 'উৎস মানুষ'-এর পরিচয়টাই প্রথমে বলে। আমি ভিতরে ভিতরে একটু আড়ষ্ট বোধ করি। কিন্তু অশোকের সোজা-সাপটা কথা, সেই প্রথম দিনেই সব আড়ষ্টতা ভেঙে দিল, দূরত্ব কমিয়ে কাছাকাছি এনে দিল পরস্পরকে।

তারপর তার সঙ্গে আমার যখন বন্ধুত্ব গড়ে উঠল, তখন মাঝে আর সন্দীপ নেই। আমিও ভুলেই গিয়েছিলাম, অশোক আদতে বিজ্ঞানের লোক। ঠোঁটকাটা স্বভাব আমাকে বরাবর অপ্রিয় করেছে অনেকের কাছে। অধিকাংশ মানুষই সত্য কথা, তা যদি অপ্রিয় হয়, শুনতে বা বলতে ভালোবাসেন না। অশোক কিন্তু যেমন স্পষ্ট করে নিজের কথা, স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করেই বলতে পারত, তেমন সত্যকথা শুনতেও তার কোনো অসুবিধা ছিল না। এমন নয় যে, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা প্রসারের বিষয়টা আমি খুব ভালো বুঝি, তবু 'উৎস মানুষ'-এর অনেক সংখ্যা নিয়েই আমি স্পষ্ট আমার মত প্রকাশ করেছি। সেসব কথা অনেক সময়ই বিরূপ মন্তব্য হত। অশোক তর্ক করত সীমাবদ্ধতার কথা বলত, ভুল বুঝত না। আর তাই অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানে কোনো অসুবিধা কখনও হয়নি। এমনও হয়েছে, আমি যা বলেছি, তুমুল তর্কের পরও মীমাংসা হয়নি। হঠাৎ পরেরদিন অশোক ফোন করে বলেছে, পরে চিন্তা করে দেখেছে, আমি যা যা বলেছি, সেটার মধ্যেও সত্যতা আছে। ক'জন মানুষ আছে যে স্বীকার করতে পারে, যা বলেছি তার সবটাই ধ্রুবসত্য নয়?

মাঝে মাঝে আমি অশোককে বেশ মুরুব্বি চালে বলতাম, 'একটু মিষ্টি ক'রে কথা বলতে পারো না? এতো অপ্রিয় কথা বলার দরকারটা কী?' অশোকও বলত, 'আমার যেমন কপাল! তোমার মতো একটা বন্ধু জুটল! একটাও ভালো কথা কি জানো না?' তারপর দু'জনেই হেসে ফেলতাম। কারণ, জানতাম আমাদের কারও পক্ষেই সেটা সম্ভব নয়। স্বভাব যাবে কোথায়!

আমি যখন আমার গাঁয়ে-গঞ্জের ঘোরার অভিজ্ঞতা, সেখানকার বাচ্চাদের সঙ্গে মিশবার অভিজ্ঞতার কথা বলেছি, অশোক অবাক হয়ে বলেছে, 'সত্যি? এরকম হয় নাকি!' চারিদিকে এতো 'সবজান্তা' মানষের ভিড়ে, অশোকের এই অকপট আচরণ আমাকে মুগ্ধ করেছে বারবার। 'সবজান্তা' বলছি কারণ-তাঁরা যা জানেন, তাতো জানেনই, যা জানেন না তাও জানার ভান করেন। এই 'ভান'টা অশোক করতে শিখল না কোনদিন। একবার ওকে উত্তর চব্বিশ পরগনার একটি গ্রামের বাচ্চাদের কথা বলেছিলাম, যারা 'ট্রেন' দেখেনি কোনওদিন। অশোক তারপর থেকে বলত, 'তোমার অপু'রা সব কেমন আছো?'

এইসব ছোট ছোট কথা বড্ড বড় হয়ে আসছে আজ। নব্বই দশকের মাঝামাঝি আমার এক সহপাঠীর মৃত্যু সংবাদ এল। সে তখন মেদিনীপুরে সরকারি আমলা। তার স্ত্রীর কাছে শুনলাম এক সাধুর খপ্পরে পড়েছিল বন্ধুটি। পেটে আলসারের ব্যথা—কিছুতেই ঠিকঠাক চিকিৎসা করালো না। এক সাধুর কাছে গিয়ে বসে থাকত—টাকা ঢালত আর সেই সাধুর দেওয়া ছাই খেয়ে ব্যাথা কমাত। পরে সাধু শেষরক্ষা করতে পারে নি। স্ত্রী যখন তাকে চিকিৎসা করাতে পারল, তখন ব্যথা আর বাগ মানে না। কলকাতায় আনার পথে অ্যাম্বুলেন্সে মারা যায় সে। ঘটনাটি আমাকে প্রায় পাগল করে তুলেছিল। 'ছাই খেতো?' মনে হলেই অস্থির হয়ে উঠতাম। অশোক তখন পাশে এসে দাঁড়াল। ওরই উৎসাহে মেদিনীপুর আবার গেলাম—ছাইয়ের নমুনা আনলাম। আমরা ভেবেছিলাম, শেষ অবধি সাধুকে আদালতে তুলব। ছাই পরীক্ষার ব্যবস্থা করল অশোক। কিন্তু ছাইতে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। কিন্তু অশোকের এই যে 'লড়ে যাওয়া'র মানসিকতা—এটা আমার বন্ধুর মৃত্যুশোককে অনেকটা প্রশমিত করেছিল।

আমরা যারা বিরাট প্রতিভার অধিকারী নই, কিন্তু সমাজ, জীবন, বেঁচে থাকা—এসব নিয়ে কিছু বক্তব্য আছে, আছে দায়িত্ববোধ— তাদের সবার হয়ে জীবন যাপন করেছে অশোক। অসুস্থ শরীরে বয়ে বেরিয়েছে বাঁচার সুতীব্র ইচ্ছাকে সম্বল করে। নিজের চিন্তাকে কাজে পরিণত করার স্বপ্নকে সে সন্মান করতে জানত। সেই কাজের পথ যে বন্ধুর—এ আমরা সবাই জানি। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতা, মধ্যবিত্ত মানসিক জটিলতার পিছুটান তাকে দমাতে পারেনি।

এইরকম একজন মানুষের সুখ-দুঃখ স্বপ্নের সঙ্গী হয়েছি কখনও! নিজেও হয়ত জড়িয়ে গেছি। তখন মনে হয়নি, আজ মনে হচ্ছে, এটা আমারও কম প্রাপ্তি নয়।

অশোক স্মৃতি হয়ে গেল

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৮২। তখন বইমেলা এত বড় হত না-ভিড়ও ছিল না। ফাঁকা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডবিল বিলি করছিল এক রূপবান যুবক। হাতে নিয়ে পত্রিকার নামটা দেখে আমি তাকে বলি, 'আপনাদের পত্রিকা আমি পড়ি।' তার আগের বছর বইমেলাতেই চন্দ্রা, আমার স্ত্রী—সে-ও পরে অশোকের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল—উৎস মানুষ (তখন নাম ছিল 'মানুষ') পত্রিকাটি দেখতে পায় এবং আমরা কয়েকটা সংখ্যা কিনে নিই। স্টল থেকে মাঝে মাঝে পত্রিকাটি কিনতাম। তখন বর্ণজাতব্যবস্থা নিয়ে একটা ধারাবাহিক লেখা বেরোচ্ছিল। লেখাটি নিয়ে আমার কিছু বক্তব্য ছিল। আমি পোস্টকার্ডে একটা চিঠি পাঠাই। জবাব পাইনি। কয়েক মাস পরে আমার চিঠিটি উল্লেখ করে লেখক সৌমিত্র শ্রীমানীর উত্তর ছাপা হয়।

অশোককে সে কথা বলতেই তার প্রতিক্রিয়া : 'আরে আপনি! আমরা তো ভেবেছিলাম একজন বৃদ্ধলোক।' আরও কিছু কথা হয়। তখন লেক টাউনে থাকতাম। সল্ট লেকের বিডি ব্লকে অশোকদের বাড়ি হেঁটেই যাওয়া যেত। মাঝে মাঝেই সকালের দিকে চলে যেতাম। নানা বিষয়ে আলোচনা হতো। ১৯৮২ সালেই 'মানুষ' পত্রিকায় প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় হিন্দু বিয়ের আচার অনুষ্ঠানে নিয়ে। তারপর আমি 'মানুষ'-এর দলে ভিড়ে যাই। পবন, ভাস্কর, স্মরজিৎ, চিত্তর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। পরে আসে লাজি, তরুণ।

'উৎস মানুষ' যে-তত্ত্ব প্রচার করত, তাকে এক কথায় বলা যায় বিজ্ঞানবাদ—সায়েন্টিজম্। এই তত্ত্বের সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত ছিলাম না। তবে অলৌকিকতার বিশ্বাস বা কুসংস্কারকে একেবারে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দিয়ে ভুল প্রমাণ করে দেবার চেষ্টাটা আমার কাছে অভিনব মনে হত। এইভাবেও বিশ্বাসের গোড়া উপড়ে ফেলা যায় কিনা তাই নিয়ে আমার মনে সংশয় আছে। তবে অশোকের ভাবনাটাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। আর সেই সঙ্গে পত্রিকা ঘিরে যে-বন্ধুগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল—তাদের প্রতি আকর্ষণও আমাকে টেনে রাখত। বারবার মতান্তর হয়েছে, মনান্তরও। কিন্তু ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত আমি প্রচুর লেখা লিখেছিলাম। অশোক ততদিনে আমাদের পারিবারিক বন্ধু। শেষের দিকে নানা কারণে সম্পর্কটা একটু আলাদা হয়ে গিয়েছিল। যখন নতুন করে জোড়া লাগছে—সেই সময়ই অশোক সকলকে বোকা বানিয়ে চলে গেল।

২২ নভেম্বর (২০০৮) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা আলোচনাসভা আয়োজিত হয়। আলোচনার বিষয় : লিট্‌ল ম্যাগাজিন। সেখানে গিয়ে আমার বার বার মনে হচ্ছিল, বাঙলা লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ইতিহাস তো একদিন লেখা হবেই। উৎস মানুষের জন্যে সেখানে বেশ কিছুটা জায়গা রাখতে হবে। লিখতে হবে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও। অশোক একটা নতুন ধরনের পত্রিকার মডেল তৈরি করে দিয়ে গেছে। ইতিহাসে অশোকের নাম থাকবেই। আর আমার মনের ভিতর থাকবে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় বলে যে-মানুষটা ছিল, তার স্মৃতি। যতদিন বাঁচব, এই স্মৃতি আমাকে বহন করতে হবে। তুই আমাকে বড়ো কষ্ট দিলি, অশোক!

'মানুষ'-এর জন্ম

অমিত সান্যাল

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৭৮ সালের গোড়ায়। আমার বয়স তখন ২১, পরিচয় হয়েছিল "মাটির কাছে" নামক এক পত্রিকার অফিসে। মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে একতলার একটি ঘর ; অফিস না বলে 'খাটাল' বলাই ভাল, কারণ বাড়ির মালিক তারকদা দুধের ব্যবসা করতেন। বাড়িতে অনেক গরু-মোষ ছিল এবং তাদের সান্ধ্য গর্জনে পত্রিকার সদস্যদের অতি উচ্চমার্গের আলোচনা প্রায়ই বিঘ্নিত হত। তবু আমরা থাকতাম। অশোকও থাকত। যতদূর মনে পড়ে প্রতি শনিবার বিকেল সাড়ে চারটে-পাঁচটা থেকে আটটা-সাড়ে আটটা অবধি চা-তেলেভাজা সহ চলত হরেক কিসিমের আলোচনা—মূলত রাজনৈতিক, সাহিত্য-সমাজও এসে পড়ত।

পত্রিকাটির নাম ছিল, 'মাটি'। কিন্তু ঐ নামে আরেকটি পত্রিকা থাকায় "মাটির কাছে" নাম রাখা হয়। শুরু হয়েছিল ১৯৭৬-এ। প্রকাশ ছিল অনিয়মিত। লেখা এলেই সেটা অজয় দে পাঠ করতেন। শুরু হত চুলচেরা বিশ্লেষণ ও মন্তব্য। শুরু হলে আর থামত না। কোনও লেখা নিয়ে প্রায় মাসাধিককাল আলোচনাও দেখেছি। ফলে অনিয়মিত প্রকাশ স্বাভাবিক ছিল। যতদূর মনে হয়, অশোকও এই পত্রিকার কোনও সংখ্যায় লিখেছিলেন। তৎকালীন সম্পাদিকা ডালিয়া ঘোষ হয়তো বলতে পারবেন।

১৯৭৯-র নভেম্বর মাসে আমি আলোচনার দীর্ঘ সূত্রতায় অতি বিরক্ত হয়ে সম্পাদিকাকে একটি পত্রাঘাত করি। অশোকও আমার সঙ্গে একমত ছিল। চিঠি নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। যথারীতি সিদ্ধান্ত হয় নি। তবে এর কিছুকাল আগে থেকেই অশোকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে এবং এই নভেম্বরের গোড়ার দিকে কফি হাউসে এক আলোচনায় ঠিক হয়, এভাবে না চলে নিজেদের একটা কথা বলার প্ল্যাটফর্ম দরকার। এও ঠিক হয়, জানুয়ারি, ৮০-তেই একটি পত্রিকা বার করা হবে। নাম ঠিক হয় 'মানুষ'। এর পরের ইতিহাস অনেকেরই জানা।

বহুদিন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে নানা জায়গায়। কিন্তু প্রায় বছরখানেক পরে জানতে পারি যে সে আমারই স্কুলের (হিন্দু স্কুল) সিনিয়র ছাত্র। সুতরাং সে অর্থে সিনিয়র দাদা। কিন্তু ততদিনে নাম ধরে ডাকায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। আর এতে তারও কোনও আপত্তি ছিল না। তাই তাকে আর 'দাদা' ডাকা হয় নি।

অশোকের মধ্যে বিপুল সাংগঠনিক ক্ষমতা, অনেক পরিশ্রম করার ক্ষমতা সুপ্ত ছিল। শুধু তার সৃষ্ট 'উৎস মানুষ'-নামক পত্রিকা নয়, আন্দোলনের মাধ্যমেও তা অনেকটাই প্রকাশিত হতে দেখেছেন সবাই। তা না হলে 'গণবিজ্ঞান'-এ বিশ্বাসী মানুষটি তার সরকারি পেশার ঊর্ধ্বে উঠে এতদিন ধরে নির্দিষ্ট মান বজায় রেখে পত্রিকা ও একইসঙ্গে পুস্তক প্রকাশ করে যেতে পারতেন না, নিদারুণ ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও।

অশোকের মৃত্যু অনেকের কাছেই ব্যক্তিগত ক্ষতি। কিন্তু আমার কাছে অনেক বড় মনে হয় গণবিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষতি। বিভ্রান্ত এই যুগে এ ক্ষতি সম্ভবত কখনো পূরণ হবে না।

ভিতর ও বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি...

গৌতম রুদ্র

নভেম্বরের শেষে নয়তো ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে একটা ফোন আসত। ওপ্রান্তের লোকটি জিজ্ঞাসা করতেন কি রে? বইমেলা তো এসে গেল। এবার কি উৎস মানুষের স্টলটা হবে না? এবছরও ফোন এসেছে, তবে কিছু পরে ওদিকে অশোকদা নেই। উৎস মানুষের অন্য একজন, বরুণদা। বইমেলায় অশোকদা স্মরণ সংখ্যা বেরোবে। একটা লেখা দিতে হবে।

অশোকদার মূল্যায়ন করবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি আমার নেই। তাই বুদ্ধি দিয়ে নয়, ব্যক্তি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হৃদয় দিয়ে গত পনেরো বছর ধরে যেভাবে জেনেছিলাম সেই জানাচেনার চেহারাটাই ধরে দিতে চাইছি।

সময়টা আশির দশকের শুরুর দিক। আমরা তখন ছাত্র। ঐ সময় থেকেই উৎস মানুষ পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ। ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যোগাযোগটা করিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের রাজনৈতিক পরিচয় ছিল তৃতীয় ধারার ছাত্র আন্দোলনের কর্মী হিসাবে। প্রতিনিধি রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রভাব বলয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে এই আন্দোলন। একে টিকিয়ে রাখা এবং চারিয়ে দেওয়ার জন্য দরকার ছিল একটা সমান্তরাল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের। সেজন্য পাড়ায় পাড়ায় শুরু হল নাটকের ক্লাব, পাঠচক্র, দেওয়াল পত্রিকা, গানের দল। এভাবেই হাতিবাগানে চেতনা গণ সাংস্কৃতিক সংস্থার জন্ম। মানুষকে আমূল বদলাতে গেলে প্রচলিত মূল্যবোধের গোড়া ধরে টান মারবার মতো সময়সাপেক্ষ কজে আমরা আগ্রহী ছিলাম না। ধারণাটা বদলে দিল উৎস মানুষ। অশোক রুদ্রের 'চতুর্থ বর্গের বিপ্লব' সিরিজের লেখাগুলো ধারাবাহিকভাবে উৎস মানুষ-এ বেরোতে শুরু করল। লেখাগুলো আমাদের ব্যক্তিগত জীবনচর্চার অসঙ্গতির দিকে আঙ্গুল তুলে দেখাচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম পেছনদিকে মুখ ঘুরিয়ে সামনের দিকে হাঁটা যায় না।

কিন্তু ধান ভানতে শিবের গীত? কথা ছিলো অশোকদার স্মৃতিচারণ করার। অথচ উৎস মানুষ নিয়েই বকে গেলাম। সত্যি কথা বলতে কি, উৎস মানুষ বা আরও বড় পরিসরে বললে, গণবিজ্ঞান আন্দোলনকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ সম্ভব নয়; অন্তত আমার পক্ষে। উৎস মানুষ ছিল অশোকদার সন্তানের মতো। ভেন্টিলেশনে যাওয়ার আগে বিকারের ঘোরেও পত্রিকার আগামী সংখ্যার খোঁজ নিয়েছে। ফিরে যাই নব্বই-এর দশকে। চেতনা ততদিনে একটু সাবালক। কিন্তু উৎস মানুষ টালমাটাল। পুরনো অনেকেই ছেড়ে গেছেন। এই ফাঁকটা পূরণ করতে গিয়ে সমমনস্ক সংগঠনগুলোর সঙ্গে উৎস মানুষ-এর সম্পর্ক আরও নিবিড় হলো। পরপর দুবছর চেতনা উৎস মানুষ-এর আড্ডার আশ্রায়ক হল।

এতদিন পর্যন্ত অশোকদার সঙ্গে কাজের প্রয়োজনে যোগাযোগ ছিল ঠিকই, কিন্তু আলাপটা বন্ধুত্বের কোঠায় এসে পৌঁছয় নি। দূর থেকেই দেখতাম। গম্ভীর আর অহংকারী বলে মনে হত। দূরত্বের ব্যবধানটা ভাঙলো চেতনা এবং উৎস মানুষ-এর পারস্পরিক প্রয়োজনে। চেতনায় তখন অনেক কচিকাঁচার ভিড়। গণবিজ্ঞান আন্দোলনে তাদের সামিল করতে হবে। এ কাজে আমাদের প্রধান সহায় ছিল অশোকদা।

বিজ্ঞানমেলায় প্রতিবারই নতুন কিছুর চাহিদা থাকে। ভাবলাম, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড-এ কোনো বিষয়কে তুলে ধরলে কেমন হয়? যথারীতি অশোকদাই ভরসা। প্রথম বছর আলোয় ও ধ্বনিতে সুন্দরবন। খুঁটিনাটি সাহায্য উপদেশ পরামর্শর পাশাপাশি অশোকদা জোর দিল বিষয়ের সঙ্গে দর্শককে একাত্ম করার ওপরে। সুন্দরবন থেকে বহুদূরে কলকাতার একজন সাধারণ লোক সুন্দরবনের জীবনবৈচিত্র্য নিয়ে কেন ভাববে? সুন্দরবন ভালো থাকলে সাধারণ মানুষও ভালো থাকবে। এই যোগসূত্রগুলো অশোকদা ধরিয়ে দিত। এরপর 'প্রমিথিউসের পথে' হলো। অত্যন্ত খটমট বিষয়। স্ক্রিপ্টভাবনাটা ছিলো অশোকদার। শুরুর গানটা ছিলো 'মহাবিশ্বে মহাকাশে'। 'প্রমিথিউসের পথে' শেষ হয়েছিল শঙ্কর গুহনিয়োগী-তে এসে। অর্থাৎ সেই একই ব্যাপার। বিষয়কে মেলাতে হবে সময়ের সঙ্গে।

দর্শককে যোগাযোগ স্থাপনে অশোকদার জুড়ি ছিল না। 'প্রমিউথিউসের পথে'-তে ডারউইনের ছবিটায় যখন আলো পড়ছে, গান বেজে উঠত "একমুখ দাড়িগোঁফ"। পোখরান বোমাবিস্ফোরণের পর রেডিওতে অশোকদা কথিকা শুরু করল জটিলেশ্বরের বিখ্যাত গানের লাইন দিয়ে— 'এ কোন সকাল রাতের চেয়েও অন্ধকার'।

ভয়ঙ্কর খুঁতখুঁতে অশোকদার গোঁ মাঝে মাঝে বিপদে ফেলে দিত। পয়সা পাব না কাজেই একটু হেলাফেলা করলে ক্ষতি কি? — এরকম অপেশাদারি মনোভাবের কোনো জায়গা ছিল না অশোকদার কাছে। মনে আছে, আলোয় ও ধ্বনিতে আন্দামান-এ সেলুলার জেলের ছবির সঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'আমরা তো ভুলি নাই শহীদ' গানটা বাজাতে হবে বলে ক্যাসেট কিনতে ট্যাক্সি করে স্টুডিও থেকে হাতিবাগান এসেছিলাম।

অশোকদার সঙ্গে বেড়াতে গেছি বেশ কয়েকবার। '৯৩ বা ৯৪-এ ম্যাকলস্কিগঞ্জ গিয়েছিলাম। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে অভ্যাসমত বারমুডা পরে চা খেতে যাচ্ছি। অশোকদা জিজ্ঞাসা করল, 'এটা পরে যাবি?" লজ্জা পেয়ে পাল্টে আসতে যাচ্ছি, অশোকদা বলল—'নানা, আমার বারমুডা ভাল লাগে না বলে বলেছি। তোর সুবিধে হলে তুই পরবি না কেন?' অথচ অশোকদা বিদ্যায়-বুদ্ধিতে সামাজিক অবস্থানে আমার থেকে এতটাই ওপরে যে ইচ্ছে করলেই নিজের অপছন্দটা আমার ওপর চাপিয়ে দিতে পারত। মতের বিভিন্নতা নিয়েও একসঙ্গে কাজ করায় অশোকদা বিশ্বাস করত। অথচ অশোকদাকেই অভিযুক্ত করা হয়েছে অসহিষ্ণু 'অটোক্র্যাট' বলে।

জীবনের শেষ দশবারোটা বছর অশোকদার সঙ্গী ছিল ক্যানিং যুক্তিবাদী সমিতির মতো কিছু সংগঠন। প্রচারের আলো থেকে দূর সমাজের একদম নীচুতলার মানুষদের মধ্যে যুক্তিবাদী আন্দোলন প্রসারের কাজে অশোকদা নিজের সমস্ত উদ্যম সংহত করতে চাইছিল। শরীর পারছিল না। ভেতর থেকে পোড়ালে ক্ষয় বড়ো দ্রুত হয়। এই ক্ষয় মানুষের জন্য, মাটির জন্য। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে ছিল মানুষের দিকে।

বিজ্ঞান ভাবনা সন্ধানী অশোক

সুশান্ত মজুমদার

'যদি কোনো প্রকারেই আসতে না পারিস (worst case) তাহলে এই aspect দু'টোতে কয়েক লাইন লিখে পাঠাস—

(1) কেন তুই উৎস মানুষ-এ যুক্ত থাকছিস এবং কী ধরনের পত্রিকা এটা হওয়া উচিত বলে তোর নিজের মনে হয়।

(2) পত্রিকার এখনকার অবস্থায়, লোক নেই, সময় নেই, লেখা নেই, উদ্বৃত্ত অর্থ নেই, concrete network নেই, ঘোষিত কর্মপদ্ধতি নেই—এর মধ্যে কীভাবে minimum space একটা দেওয়া যায় এবং তুই minimum কতটুকু help করতে পারিস (regular)। এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা খড়কুটো একটা কিছু ধরতে চাইছি। ৪/৫ লাইন লিখে পাঠাস—তবে আপ্রাণ চেষ্টা করিস আসতে।"

১৯৮৮ সালের ২৮/৭ তারিখে অশোক আমাকে এই চিঠিটা লিখেছিল, ১৫ই আগস্ট ওর বাড়িতে উৎস মানুষ সংক্রান্ত একটা মিটিং-এ উপস্থিত থাকার আহ্বান জানিয়ে। আমি তখন বর্ধমানে থাকি। ইনল্যান্ড লেটারের ছাপ দেখে বুঝছি, চিঠিটা আমার কোলকাতার ঠিকানা থেকে redirected হয়েছিল। আমি ওটা হাতে পেয়েছিলাম ১৫ তারিখের পরে। সুতরাং, মিটিং-এ উপস্থিত ছিলাম না। তবু চিঠি থেকে উদ্ধৃতিটা দিলাম অশোক মানুষটাকে বোঝার জন্য। যুক্তি ও সুনির্দিষ্টতা ছিল অশোকের বড় পছন্দ। তাই, চার-পাঁচ লাইনের মধ্যে উৎস মানুষ-এর সমস্যাগুলিকে তুলে ধরে, ৪/৫ লাইনের মধ্যে জানতে চাইছে তার বন্ধু কতটুকু সাহায্য (অবশ্যই regular) করতে পারে। আবেগ দিয়ে বড় কিছু লিখলে অশোক নিশ্চয় গালি দিত — 'দূর শালা, এত ফেনিয়ে তোকে কে লিখতে বলেছে?'

অশোকের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৭৮ সালে। মাসটা ঠিক মনে নেই। তখন আমরা 'মাটির কাছে' বলে একটা পত্রিকা প্রকাশ করি। মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের একটা ঘরে বুধ আর রবিবার বসতাম। লেখা পড়া হতো। 'মাটির কাছে'-তে আমরা সব ধরনের লেখা ছাপার চেষ্টা করতাম, যার মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক লেখাও থাকত। মনে হয়, সে কারণেই ও আমাদের আড্ডায় এসেছিল। একটা লেখাও ছাপা হয়েছিল। তবে কিছুদিনের মধ্যে আমাদের বলে যে ও শুধু বিজ্ঞান বিষয়ক একটা পত্রিকা প্রকাশ করতে চায়। এ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আমার সঙ্গে কথা হয়নি। ঠিক মনে নেই, কেন 'মানুষ'-এর প্রাক্ প্রকাশনার সময়টাতে আমাদের যোগাযোগ হয়নি। তার প্রথম সংখ্যা সঙ্গে সঙ্গে হাতে পেয়েছিলাম এবং এটা যে আর পাঁচটা লিটিল ম্যাগাজিনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের, তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। ১৯৮০ সালের মে মাসে কর্মসূত্রে আমি কোচবিহারে বদলি হই কিন্তু অশোকের সঙ্গে চিঠিপত্র মারফত ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। কোচবিহারে আমি কয়েকজনকে 'মানুষ' বা উৎস মানুষ-এর গ্রাহকও করেছিলাম।

আশির দশকে উৎস মানুষ এর সাফল্যের একটা সামাজিক প্রেক্ষাপট ছিল। আশির দশকের শিক্ষিত যুবকদের বিরাট একটা মহল, সত্তর দশকের রাজনৈতিক বিপ্লব সংগঠিত করার ব্যর্থতাকে পুরোপুরি মেনে না নিয়ে সাংস্কৃতিক সামাজিক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে ব্রতী হয়। এ ধরনের অসংখ্য উদ্যোগের মধ্যে আমার মতে উৎস মানুষ ছিল সফলতম। দুই দশকের বেশি সময়কাল, উৎস মানুষকে ঘিরে বিভিন্ন পাঠক গোষ্ঠী ও বিজ্ঞান ক্লাবগুলি পশ্চিমবাংলায় যে কুসংস্কারবিরোধী প্রচার গড়ে তুলেছিল, তাকে সামাজিক আন্দোলন ভিন্ন অন্য কোনো বিশ্লেষণে চিহ্নিত করা যায় না। অশোক ছিল এই আন্দোলনের প্রধান কাণ্ডারী।

অথচ ছিল চাকুরীজীবি এবং পরবর্তীকালে সংসারি (দীর্ঘদিন স্ত্রী কন্যারা থাকতেন শিলিগুড়িতে, ফলে ওর টানাপোড়েন ছিল অনেক বেশি)। এ হেন মানুষটি কীভাবে এই আন্দোলনের নেতা হতে পেরেছিলেন? ওর চরিত্রে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল যা ওকে এই সাফল্য এনে দিয়েছিল। প্রথমত, কর্মক্ষেত্রে ওর একাগ্রতা। অশোক বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়া কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও উৎস মানুষ সবসময়েই ছিল ওর মূল ক্ষেত্র। এবং আমি দেখেছি, ও সব সময়েই চেষ্টা করতো কীভাবে ওর অন্যান্য ক্রিয়াকর্মের যোগাযোগকে উৎস মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত করা যায়। দ্বিতীয়ত, কোন অবস্থায় কতটুকু দায়িত্ব হাতে নেওয়া যেতে পারে, সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। নিজের সংগঠনের, আজকের যুগের management-র ভাষায় বললে, strength and weakness analysis করার দক্ষতা ছিল ওর অসাধারণ। নিজের সংগঠন নিয়ে নৈর্ব্যক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করতে খুব কম মানুষই পারেন - অশোক এদিক দিয়ে ছিল ব্যতিক্রমী। তবে যে আন্দোলনের স্রষ্টা ও ছিল, সেখানে এই ব্যাপারগুলো ছাড়াও যে দক্ষতাটা ওকে সাফল্য এনে দিয়েছিল, তা হচ্ছে ওর অসাধারণ Communication Skill। ওর এই দক্ষতা শুধুমাত্র লেখা ও বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কীভাবে একটি বিষয়কে সাধারণ মানুষের কাছে সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হয়, তার সবকটি বিষয়ে ওর দক্ষতা ছিল অনন্য। এই অনন্য ক্ষমতার বলেই অশোক ওই সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে পেরেছিল।

ওর মত সাবলীল অথচ বলিষ্ঠ বাংলা লিখতে আমি খুব কম লোককে দেখেছি। অশোকের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাপার আমার মতবিরোধ হতো। বিশেষত, উন্নয়নের ধারণা ও প্রযুক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে। কিন্তু এই মতবিরোধ কখনও ব্যক্তিগত সম্পর্ককে প্রভাবিত করেনি। বিভিন্ন ব্যাপারে ফোনে কথা হতো। বিজ্ঞানবিষয়ক কোনো লেখার কথা ভাবলে, ওর সঙ্গে কথা বলতাম। আবার অশোকের আপেক্ষিকতা সংক্রান্ত বইয়ের লেখাটা প্রাথমিকভাবে, আমাদের উভয়ের বন্ধু ভূপতি চক্রবর্তী ও আমার অনুরোধেই ও লিখেছিল। কারণ আমাদের মনে হয়েছিল, আপেক্ষিকতার মতো একটা জটিল বিষয়কে, সহজ করে কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী করে লিখবার জন্য অশোকই উপযুক্ত।

আমাদের বয়স হচ্ছে। নতুন বন্ধু এখন আর হয় না। কোনো ভাবনা মাথায় এলে খোলা মনে কথা বলার লোক কমে আসছে। অশোক চলে যাওয়াতে শূন্যতাটা বেড়ে গেল।

সেই জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল !

বজলুর রহিম

কলকাতা। ২০০১ সনের মার্চ মাস। বেলা প্রায় ৩টা। কলিন স্ট্রিটের 'গুলশন লজ' হোটেলের লবিতে অপেক্ষা করছি সরাসরি পত্রালাপ এবং 'উৎস মানুষ' পত্রিকার সূত্রে পরিচিত হওয়া-না-দেখা একজনের জন্য। নানা ভাবনায় কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম কাঁধে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ধীর পদক্ষেপে ওপরে উঠছেন একজন। মনে হল, তিনিই। কাছে গিয়ে পরিচয় দিলাম, জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর শ্রুৎসমস্যার কথা জানা থাকায় পিঠে হাত রেখে দোতলায় উঠতে সাহায্য করলাম। রুমে নিয়ে বসালাম, পরিচয় করিয়ে দিলাম আমার স্ত্রী ও শ্যালিকার সঙ্গে। চেয়ারে বসতে বলায় বললেন, 'বিছানাতেই বসি, কাছাকাছি হবে।' টানা দেড় ঘন্টা ছিলেন তিনি আমাদের সঙ্গে। অশোকদা, আপনার কথার মধ্যে প্রাণের পরশ ছিল, ছিল আন্তরিকতার ছোঁয়া, আপনার সান্নিধ্য সকালবেলার আলোর মতো মনের মধ্যে আভা ছড়িয়েছিল। যদিও ওটাই ছিল আমাদের মধ্যে প্রথম দেখা এবং আজ বলতে হচ্ছে দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ দেখাও। বন্ধুত্ব তো কতজনের সঙ্গে হয়! কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয় না হলে হয়ত 'প্রকৃত বন্ধু' কাকে বলে তা জানা হত না। আজ আপনি যখন কাছে নেই, আপনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা স্মৃতির কথাগুলো কেমন করে বলি!

আপনার সঙ্গে যোগাযোগের সূচনা ১৯৮৫ সনের শেষের দিকে। পত্রিকা বিনিময় হত। আপনি 'উৎস মানুষ' পাঠাতেন, আমি 'মাসিক গণস্বাস্থ্য'। চিঠি লেখার সূত্রপাত আরো পরে। পত্রিকার সূত্র ধরেই পোস্ট কার্ডে ছোট ছোট চিঠি লিখতেন, জবাব দিতাম আমি। ছোট হলেও গুরুত্বপূর্ণ কথায় ঠাসা থাকত সেসব চিঠি। এভাবেই সম্পর্কের ভিত দৃঢ় হয়েছিল। 'উৎস মানুষ' নিয়ে আপনার ভাবনা, আপনার উদ্বেগ, সাধারণ মানুষকে সহজ কথায় বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনায় কীভাবে সামিল করা যায় তা নিয়ে যথেষ্ট ভাবতেন আপনি এবং 'উৎস মানুষ'-এর পাতায় সেসব ভাবনা পাখা মেলত। এত সহজ ভঙ্গিতে সেসব প্রকাশ করতেন আমার অবাক লাগত। কত সহজ করে বিজ্ঞান-ভাবনা বা বিষয়গুলি প্রকাশ করা যায় 'উৎস মানুষ' সে-পথ দেখিয়েছিল। পরিচয়-পরবর্তী বেশ কয়েকটা বছর চিঠিই ছিল তখন আমাদের যোগাযোগের মাধ্যম, ই-মেইল ঠিকানা আমাদের কারো তখন ছিল না।

আমার বাবার ওপর একটা লেখা পড়তে দিয়েছিলাম আপনাকে। ওটা পড়ে আপনি জানিয়েছিলেন এক মজার কাকতালীয় ঘটনার কথা। আর তা হলো আপনারা দুজনেই একই কলেজের (সাবেক ইসলামিয়া কলেজ, বর্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজ) ছাত্র ছিলেন। অশোকদা, কী অনায়াসে নিজের ছাত্রজীবন ও রাজনীতির কথা তুলে ধরেছিলেন আমার কাছে। লিখেছিলেন: ১৯৬৮-৬৯ সনে প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকেছিলাম। সিপিআই (এমএল) রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে অ্যাবস্কন্ডিং থাকা এবং 'বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা'র মগজ ধোলাইয়ের সুবাদে পড়ায় ছেদ পড়ে। তারপর আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় ফিজিক্স-এর অধ্যাপক ড. শ্যামল সেনগুপ্ত পরের দুটো বছর মৌলানা আজাদ কলেজে আমার অ্যাডমিশন করিয়ে দেন। ওখান থেকে বি-এস-সি পাশ করি। (চিঠির ভাষ্য/১২ মে ২০০৮)

কিন্তু এককালে সিপিআই-এর রাজনীতি করতেন বলে পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতাসীন বাম শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় আচরণ কখনো মেনে নেন নি। নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। সেখানে অত্যাচারিত মানুষের মর্মস্পর্শী বিবরণ তুলে ধরেছিলেন 'উৎস মানুষ'-এর একটি বিশেষ সংখ্যায়।

আপনার প্রতি আমার এতটাই নির্ভরতা আর বিশ্বাস ছিল যে, আমার বাবার ওপর প্রকাশিত একটি বইয়ের কিছু কাজের ভার আপনার হাতে দিয়েছিলাম। বিষয়টা আপনার চেনা জগতের বাইরের হলেও আপনি কাজটা ফিরিয়ে দেন নি, প্রায় ছয় মাস ধরে অল্প অল্প করে সে-কাজটা করে দিয়েছিলেন অসম্ভব যত্নে। এই বইয়ের কাজে যখনই কলকাতার কোনো তথ্য জানার প্রয়োজন হয়েছে আপনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আজ যখন এই বইটি ছাপার কাজ চলছে, আপনি পাশে নেই-এই কথাটা কেমন করে বলি!

আমাদের দুজনের পত্রিকার একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। দুটি পত্রিকাই মূলত সহজ ভাষায় স্বাস্থ্যবার্তা, বহুজাতিকের ফাঁদ, বিজ্ঞাপনের ফাঁদে ফেলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর জিনিস কীভাবে বিক্রি হয়, কীভাবে সেসব আমাদের শরীর-স্বাস্থ্যের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে, কীভাবে সেসব আমাদের শরীর-স্বাস্থ্যের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে, কীভাবে অপ্রয়োজনীয় টনিক-ভিটামিন গিলিয়ে পকেট লোপাট করা হয় তার ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হতো। তবে সেসব প্রকাশের ক্ষেত্রে আপনি যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন তা ছিল অননুকরণীয়। এ ভাষা সবার আয়ত্তে থাকে না। সাধারণ মানুষের কথা, সমাজের কথা ভাবতেন বলেই 'আকাশবাণী'র মত প্রতিষ্ঠানের চাকরি ছাড়তে দ্বিধা করেননি আপনি। 'উৎস মানুষ' ছিল আপনার প্রাণ। অন্যান্য সিরিয়াস বিজ্ঞান পত্রিকার তুলনায় আপনার পত্রিকা ছিল অধিকতর পাঠকপ্রিয় এবং প্রচারও ছিল ঈর্ষণীয়। 'মাসিক গণস্বাস্থ্য' পত্রিকা সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন, গণস্বাস্থ্য উৎস মানুষেরই সমচরিত্রের দায়বদ্ধ পত্রিকা। এদের বেঁচে থাকা ক্রমশ কঠিন হয়ে তো পড়বেই (১২ ফেব্রুয়ারি ২০০২ সনে লেখা চিঠি)। আরো বলেছিলেন, "গণস্বাস্থ্য'র একটা নিজস্ব চরিত্র আছে, স্পেশিফিক অ্যান্ড সাসটেইন্ড এরকম পত্রিকা, এতদিন ধরে বেঁচে থাকা, বাংলায় আর নেই। এর থেকে বড় কথা আর কী হতে পারে!' (ই-মেইল/১০ মে ২০০৮)।

অশোক'দা, আপনি দুরারোগ্য কার্ডিয়াক ম্যায়োপ্যাথিতে ভুগছিলেন অনেক বছর থেকে। কিন্তু পত্রিকার প্রতি প্রাণের টান, মানুষের জন্য ভালবাসা, আপনাকে কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে নি। এক অদম্য মানসিক শক্তি নিয়ে আপনি কাজ করে গিয়েছেন। যদিও অর্থ, লোকবল,

অফিসের জন্য কোনো ঘর না-থাকা এবং অন্যান্য টানাপোড়েনে পড়ে 'উৎস মানুষ' মাসিক থেকে দ্বিমাসিক করতে হয়েছিল। এ নিয়ে আপনার মধ্যে নিরন্তর একটা কষ্ট ছিল। তারপরও বসে থাকার মানুষ ছিলেন না আপনি। ঘর পাননি বলে নিজের আবাসটাকেই পত্রিকার অস্থায়ী কার্যালয় বানিয়েছিলেন। আপনার হাত থেকে একের পর এক বেরিয়েছে কী অসম্ভব দরকারি সব সংখ্যা। লেখায়, বিষয় বৈচিত্র্যে যা ছিল অতলুনীয়। কিন্তু একক শ্রমে আর টানতে পারিছিলেন না। লিখেছিলেন, 'প্রাণের জিনিস' 'উৎস মানুষ' বের করার লোক আরো কমেছে। টোটাল ম্যানেজমেন্ট আমি একলা আর করতে পারছিনা, সম্ভব নয়। এই বাংলা থেকে আমি আপনার পত্রিকার জন্য কিছুই করতে পারি নি...এই কষ্টের কথাটা কেমন করে বলি!

অশোকদা, গত সেপ্টেম্বর মাসে আমার ছোট ভাই কলকাতা গিয়েছিল। অসুস্থ শরীর নিয়েও তাকে অনেকটা সময় দিয়েছিলেন আপনি। আপনাকে বলেছিলাম, একটা বইয়ের কথা। কিনে দিয়েছিলেন কিন্তু বলেছিলেন, 'দাম নিতে বলবেন না।' এই কথার একটা ছোট জবাব ২/৩ লাইনে দিয়েছিলাম আমি। তারপর আপনি যা লিখেছিলেন তা এক কথায় আমার কাছে ছিল অবিস্মরণীয়। আপনি লিখেছিলেন :

'বিউটিফুল দাদা, আপনার চিঠি আমার মন ভরিয়ে দিল। আমি ভীষণ ইমোশনাল, ভীষণ বন্ধুবৎসল ছিলাম, আবার ভীষণ ক্রিটিক্যাল অ্যাবাউট অনেস্টি অ্যান্ড ইনটিগ্রিটি, যা আমার নিজের সম্পদ। এর ফলে, এই নিষ্ঠুর স্বার্থপর দুনিয়ায় চলতে চলতে যখনই কোনো হিপোক্রাসি দেখেছি, কৃত্রিমতা দেখেছি, আমার ভালো লাগেনি, বন্ধুবিচ্ছেদ হয়েছে নীরবে। তার ওপর আমি সব সময় স্পষ্ট কথা বলি, না হলে চুপ করে থাকি। এটা শিক্ষিত এলিট লোকেরা মানতে পারে না, ভালোভাবে নেয় না। বাট্ আই নেভার কেয়ার। নেট রেসাল্ট আমি অন্তর থেকে আনকোশ্চেনড্ অনেস্ট রিলেশন প্রায় খুঁজেই পাই না। ইউ অ্যাপিয়ার্ড অ্যাজ অ্যান এক্সেপশন টু মি। কী জানি কীভাবে এতটা ম্যাচিওর্ড বয়সে এসে আপনাকে অসম্ভব কাছের লোক বলে ফিল্ করি ; মে বি ফর ইওর সিমপ্লিসিটি অ্যান্ড অনেস্টি, ঠিক জানি না। যার সঙ্গে যে কোনো কথা, যে কোনো ভাবনা, যে কোনো সমালোচনা অকপটে করা যায়, উইদাউট মিনিমাম হেজিটেশন, সেই তো সত্যিকারের বন্ধু, তাই না? কিন্তু এরকম বন্ধু আর কই? প্রজাতিটাই যেন হারিয়ে যাচ্ছে। তাই আই অ্যাম প্রাউড অব মাই রিলেশনস্ উইথ ইউ।

হ্যাঁ, একবার আপনি আসুন। আমার হার্ট-এর সমস্যাটা এমন যে ২৪ ঘন্টা ক্লান্ত থাকি, 'ফিট' প্রায় কখনোই থাকি না। জোর করে সব কাজ করি। একদম এক্সট্রা স্ট্রেইন নিতে পারি না। ভয় লাগে আজকাল। দু-দুবার সিভিয়ার ফেইলইওর-এর কষ্টটা তো অনুভব করেছি। না হলে ভীষণ ইচ্ছে করে একবার অন্তত আপনার ওখানে যেতে। আজ মনে হচ্ছে, আরেকবার ডাক্তারের পরামর্শ নেব। এয়ার জার্নি অ্যালাউ করবেন কিনা।

আশাই তো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।'

অশোকদা, আরো অনেককাল বেঁচে থেকে আরো অনেক কাজ আপনি করতে চেয়েছিলেন। লিখেছিলেন, 'শরীরের কারণে গৃহবন্দী অধিকাংশ সময়।...'বাঙালির আয়ু বেশি নয়' কে বলল? মনের জোরে বাঁচতে হয়। পৃথিবীতে মানুষের চরিত্র কী বিচিত্র ভাবুন তো! যত দেখি ততই আরো অভিজ্ঞতা বাড়াতে ইচ্ছে করে। তাই বাঁচতেও ইচ্ছে।" (চিঠির ভাষ্য/৯ জানুয়ারি ২০০২) অশোকদা, ২০০২ সন পেরিয়ে ২০০৮ শেষ হতে চলেছে। আপনি নেই...এই কষ্টের কথাটা কেমন করে বলি!

সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'উৎস মানুষ' যখন বেরোয়, আমাকে যথারীতি কপি পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এটাই শেষ সংখ্যা! সংখ্যাটা অসম্ভব ভালো হয়েছিল। আমি পড়ে বিস্তারিত মতামত দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, এখান থেকে বেশ কিছু লেখা আমি 'মাসিক গণস্বাস্থ্য' পত্রিকায় রিপ্রিন্ট করব। আপনি শুনে খুশি হয়ে বলেছিলেন, 'গুড আইডিয়া। ক্যারি অন। যদি গণস্বাস্থ্য'র পাতায় 'উৎস মানুষ' বেঁচে থাকে সেটাও লাভ।' অশোকদা, আপনি কি সত্যি বুঝতে পেরেছিলেন উৎস মানুষ আর বেরুবে না এবং গণস্বাস্থ্য'র পাতায় বেঁচে থাকবে আপনার কাগজ!

অশোকদা, গ্রাম ভালবাসতেন আপনি। সুযোগ ও সময় পেলেই চলে যেতেন গ্রামে। ৫ অক্টোবর তারিখে লিখেছিলেন, 'আমার প্রিয়-গ্রাম-মফস্বলে একটু যাওয়ার প্ল্যান আছে। সুন্দরবন-এ যুক্তিবাদীদের কাছে আর রানাঘাটে একটা এতিমখানায় দু-দিন করে যাওয়ার ইচ্ছে আছে...'

সময়টা ছিল পুজোর। এত আলো আর আনন্দের মধ্যেও আপনি গরীব মানুষের কথা ভোলেননি। লিখেছিলেন, '...এখন দুর্গাপুজোর উৎসব চলছে। চারপাশে অনেক আলো, অনেক গান, অনেক অনুষ্ঠান, দারিদ্র্য পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেছে।"

অশোকদা, আপনার সঙ্গে সবকিছু শেয়ার করতাম। আমার পত্রিকার লেখা সংগ্রহে যখনই সংকট দেখা দিয়েছে আপনি হাত বাড়িয়ে দিতেন তাৎক্ষণিকভাবে। পিডিএফ করে লেখা পাঠিয়ে দিতেন। মাসে কয়েকবারই যখন তখন আপনার সঙ্গে ই-মেইল যোগাযোগ হত। অধিকাংশ দিন রাতের বেলা মনের জানলা খুলে নিরন্তর আলোচনা হত আমাদের মধ্যে - আমাদের পত্রিকা, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, সামাজিক দায়বদ্ধতা, নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর এবং আরো কত কী নিয়ে। চারপাশ থেকে খোলা বাতাসের সেই নাচানাচি কী যে ভালো লাগত। সেই জানালাটা ১৭ নভেম্বর থেকে বন্ধ হয়ে আছে ; অশোকদা, এই কষ্টের কথাটা কেমন করে বলি!

আপনি জন্মান্তরে বিশ্বাস করতেন না। আমিও তাই। তারপরও বলি, অশোকদা, আবার যদি দেখা হত!

-----০-----

পথ চলার বন্ধু

জয়া মিত্র

'উৎস মানুষ থেকে অশোক বলছি, একটা লেখা পাঠাবার কথা ছিল—' এই ছিল প্রথমদিকের মানে সেই তিরাশি চুরাশি সালের পোস্টকার্ডের ধরন। তখন ফোন ছিল না আমার। বোধহয় অশোকেরও ছিল না। রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটের সেই ছোট ঘরে সামনাসামনি আলাপ। তার পর থেকেই সেই লেখার তাগাদার গল্পটা শুরু হয়। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে সেটা দাঁড়ায় ফোনে 'অশোক বলছি, কোথায় তোমার—'। তখনও গদ্য প্রায় লিখিনি। একটু আধটু, ওই 'উৎস মানুষ-এ। বইমেলার স্টলে একদিন দুপুরে অশোক হাসছিল 'লোকে, যাই বলুক, আমি কিন্তু ধরে নিয়েছি তুমি উৎস মানুষ-এরই লেখক'। কীই বা লিখি তখন! ৮২ সালে বার্ণপুর সিনে ক্লাবে দেখেছি 'হাফ লাইফ' বলে একটা ভয়ঙ্কর ছবি। এক বয়স্ক মার্কিন দম্পতি তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরণের পর 'থ্রি মাইলস্ আইল্যান্ডে' মানুষদের অবস্থা নিয়ে এক ঘন্টার একটা তথ্যচিত্র তোলেন। দুঃস্বপ্নের মত এক অবস্থার ছবি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে তাঁরা দেখাচ্ছিলেন সেই ছবি। তখনও তেজস্ক্রিয় বিকীরণ ব্যাপারটার সঙ্গে পরিচয় ছিল না। পরমাণু শক্তির বিপদ নিয়ে একটু একটু লিখি 'উৎস মানুষে'। কখনও হয়ত কিছু অনুবাদ করি।

'উৎস মানুষ' পত্রিকা হাতে এসেছিল আরও বছর খানেক আগে। কলকাতা শহরের কোন ম্যাগাজিন স্ট্যান্ডে। মলাট আর নাম টানে প্রথম। খুলে বেশ অবাক। কলকাতা থেকে সাড়ে তিনশ কিলোমিটার দূরে তখন এরকম কোনো পত্রিকা বা তার খবরও পৌছত না। তো সেই হাতে পাওয়া পত্রিকায় বিজ্ঞানের নানান বিষয় নিয়ে সহজ ভাষায় ছোট ছোট সুন্দর আলোচনা দেখে সাত-আট বছরের এক উৎসাহী ছেলে প্রশ্ন করে সমুদ্রের জল নীল দেখায় কেন? সম্পাদকের নামে সে চিঠিখানা পাঠিয়ে দেওয়া হয় পত্রিকার ঠিকানায়। আর, দিন পনেরোর মধ্যে গোটা গোটা হাতের লেখায় উত্তর আসে সরাসরি ছোট্ট প্রশ্নকর্তার নামে। নিচে সম্পাদকের নাম সই করা—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ব্যক্তিগত সংলগ্নতা, বলা বাহুল্য, পত্রিকাটি সম্পর্কে এক আলাদা আগ্রহ তৈরি করেছিল।

পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে, পত্রিকা ছাপিয়েও বন্ধুত্ব হল অশোকের সঙ্গে। চারপাশে দিনও পাল্টাচ্ছিল দ্রুত। সোভিয়েতের পতন, পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে বেরিয়ে আসা ফিল্ম কবিতা ডায়েরি প্রতিবেদন—ঝড়ের পাতার মত ওলটপালট হচ্ছিল আমাদের অনেকের মানস। ব্যক্তিগত যাপনও। সেই সংকটকালে, মনুষ্য সভ্যতাকে আবার নতুন করে বুঝবার চেষ্টার কালে যে বন্ধুদের সঙ্গে বারে বারে কথা হচ্ছে, মূল্যবোধ নিয়ে, সঠিক বেঠিকের ধারণা নিয়ে।

উৎস মানুষের আড্ডা কিন্তু হচ্ছে। ৮৯ ভাগলপুরে যোগাযোগ ঘটেছে গঙ্গামুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে। মনে প্রশ্ন উঠছে নদী বড়বাঁধ জেলেজীবন সেচ চাষ মুক্তনদী নিয়ে। প্রকৃতির সঙ্গে মানবসভ্যতার সম্পর্ক নিয়ে। আরও খানিক পরে ধরা পড়ল অশোকের অসুখ। একেবারে ব্যক্তিগত সঙ্কটের মধ্যেকার বন্ধুত্ব।

কোথাও একটু হয়ত ভুল বোঝাবুঝি। আমিও অন্য কাজে জড়িয়ে পড়ছি ক্রমশ। নিজের বিষয় হয়ে উঠছে নদী, নদীজল, জলের নিয়ম। গদ্য লেখা বাড়ছে। বাইরে যাওয়া ও ব্যস্ততা বাড়ছে। পাঁচ-ছয়-সাত বছরের অন্তরাল আবার ভাঙে ১৯৯৭ সাল। 'নিরাপদ মাতৃত্ব' নিয়ে সংকলন করবার কথা ভাবছে অশোক। লেখা চাই। দরকার কাগজপত্রও পাঠায় কিছু। আবার সেই লেখার দেরি তাড়া দেওয়া, ডেট ফেল করা। শেষ পর্যন্ত লেখা দিতে পেরেছিলাম কি না এখন আর মনে নেই। উৎস মানুষের জন্য একটা জায়গা খুঁজছে অশোক। সংস্কৃত কলেজের মুখোমুখি এক জায়গায় কয়েকদিন, হ্যারিসন রোডে ব্যান্ডের দোকানগুলোর মাঝামাঝি এক জায়গায় কয়েকদিন। কোনখানটাতেই স্থির হওয়া যাচ্ছে না। অসুস্থতাও বাড়ছে, হতাশাও। তবু, প্রায় বিছানায় শুয়ে শুয়েই সম্পাদনা করছে কাগজ। প্রায় দিনই কথা হচ্ছে কিভাবে উৎস মানুষ-এর প্রতিটা সংখ্যাই শেষ সংখ্যা বলে ও ভাবছে। একই সঙ্গে এই উদ্ভাসিত খবরও দিচ্ছে যে যখন ও আর স্বাভাবিক ভাবে ঘোরাঘুরি, কাজকর্ম করতে পারবে না বলে বুঝতেই পারছে সে সময়ে কি ভাবে এগিয়ে এসেছে একদল কমবয়সী ছেলেমেয়ে। কিভাবে তারা দায়িত্ব নিচ্ছে উৎস মানুষ প্রকাশ করার।

ডাংকেল ড্রাফট, রাসায়নিক চাষ, বড় বাঁধ তারপর বিশ্বায়ন নামের এই রাক্ষুসে হাঁ, ক্রমশ বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে দিন। উৎস মানুষ খানিকটা অনিয়মিত। চারপাশে ক্রমশ কমে আসছে গণতান্ত্রিক স্পেস। তবু মাঝে মাঝে কোন লেখা পড়ে হঠাৎ অশোকের চিঠি কিংবা দীর্ঘ ফোন খানিক মন ভালো করে দেয়। ক্রমশ অসুস্থতা বাড়ছে। কোনো ঘটনায় নিজেকে আর সামলাতে না পেরে হয়তো বেরিয়ে এল এক দুদিন, একটু ঘোরাঘুরি করল তারপর শুয়ে পড়তে হল আবার। পুরোনো বন্ধুরাও প্রায় নিরুদ্দেশ। তবু ওইসব ফোন কল-এ আবার নানারকম নতুন স্বপ্ন দেখতাম আমরা।

এইসবের মাঝখানে এসে পড়ল সিঙ্গুর-হরিপুর-নন্দীগ্রাম। দীর্ঘ মূর্ছার অসাড়তা ভেঙে যেন জেগে উঠছে বাংলা। সিঙ্গুরে ধানগোলায় দাউ দাউ আগুন, কিশোরীর দগ্ধ দেহে, নন্দীগ্রামে প্রার্থনারত মানুষের ওপর পুলিশের গুলি। কলকাতা শহর বহুদিন পর আবেগে দুলছে ঝড়ের মুখে নদীর মত। এরমধ্যে কি শুয়ে থাকা যায়? ১৪ই নভেম্বর ২০০৭ এর সেই গৌরবময় মিছিলে মিলল অশোকেরও পা। নিহত নির্যাতিত ভাইবোনদের শোক বুকে নিয়ে অত্যাচারের শক্তির সামনে রাজপথ বারান্দা অলিন্দ ছাদ ভরে ফেলল সে মিছিল। হতাশার দিন যেন জোর করে কাটিয়ে ফেলে আবার নানা কাজের স্বপ্নে নিজের শক্তি জড়ো করতে শুরু করেছিল অশোক। নভেম্বর মিছিলের স্বরূপ বিশ্লেষণ করার কথা ভাবল। যাঁদের কাছে লেখা চাওয়া হয়েছিল প্রায় সকলেই সাড়া দিলেন। 'উৎস মানুষ' বেরোল 'স্বতস্ফূর্ত প্রতিবাদে'র সেই বিশেষ বিষয় নিয়ে।

গত অক্টোবরের প্রথম দিকে খবরের কাগজে নারী-পুরুষ আর পুরুষতান্ত্রিকতা বিষয়ে আমার একটা লেখা পড়ে উদ্বেল হয়ে ফোন করল। বারো কি তের তারিখ ছিল সেটা। অনেকক্ষণ কথা বলল। ঢালাই করা বাঁধা কাজের বাইরে নিজস্ব ভাবনা উসকে নেওয়ার জায়গা কতো দরকার-এইসব নিয়ে। 'এবার কলকাতায় এলে—' আবারও। তখন কি জানি যে এই শেষবার কথা বলছি! কতোবার কতো পরিকল্পনা হয়েছে, মৃদু অনুযোগও। আমি সময় নিয়ে আসি না, বসে অনেকক্ষণ গল্প করা যায় না। দুদিন নিষ্প্রাণ, পাথর বাঁধানো হলঘরটার মধ্যে। এই বাড়িটার ওপরতলায় কোথায় যেন শুয়ে রইল অশোক। জানতেও পারল না। ওর দাদারা, মিত্রা জিজ্ঞেস করলেন আমি যেতে চাই কি না। নাঃ। গিয়ে তো কোনো কাজে লাগব না। আমার তো দেখা করতে আসার কথা ছিল, দেখতে আমার নয়।

অশোক এখনও স্মৃতি হননি

নিরঞ্জন হালদার

উৎস মানুষ পত্রিকার সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মধ্যে থেকে হারিয়ে গিয়েছেন। মাত্র ৫৮ বছর বয়সে। তিনি মাঝে মাঝে অসুস্থ হতেন, কখনও নার্সিংহোমে ভর্তি হতেন, সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে ফিরতেন। সুস্থ হয়ে আবার কাজে নামতেন। অসুস্থ শরীর নিয়ে কোথায় না তাঁকে দেখেছি! ১৯৯৮ সালে পোখরানে ভারতের পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পর কীভাবে কলকাতায় প্রতিবাদ জানাতে হবে, তা নিয়ে এক সভা হয় ভারতসভা ভবনে। হঠাৎ হলের মধ্যে অশোকবাবুকে ঢুকতে দেখে চমকে যাই। জিজ্ঞাসা করি, আপনি অসুস্থ শরীরে এলেন কেন? জবাব দিলেন, না এসে পারা যায়? আমি অসুস্থতার জন্য পরবর্তী ৬আগস্ট হিরোশিমা দিবসের পদযাত্রায় পা মেলাতে পারিনি। কিন্তু অসুস্থ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গৌরকিশোর ঘোষ সারাটা পথ হেঁটেছিলেন। সুন্দরবনে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রতিবাদে ক্যানিংয়ে আলোচনা সভা হয়েছিল। অসুস্থ শরীরের জন্য আমি কিছুক্ষণ থেকে চলে এসেছিলাম, কিন্তু অসুস্থ শরীর নিয়ে অশোকবাবু পুরো সময়টা ছিলেন।

পাড়ার এক দোকানদার আমাকে শুনিয়েছিলেন, আপনার বন্ধু অশোক মারা গিয়েছেন। আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। নার্সিংহোমের ডাক্তারদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কিন্তু আমার মনে পড়ছিল আমার পুরনো অভিজ্ঞতার কথা। অশোকবাবু নিশ্চয়ই একদিন হঠাৎ হাজির হবেন, নতুবা ফোন করে বলবেন, চার-পাঁচ দিনের মধ্যে উৎস মানুষের জন্য একটা লেখা দেবেন? দেখবেন, যেন বেশি বড় না হয়? আমার ভাবতে ইচ্ছে করছে যে, আমি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে একটা ফোন পাওয়ার আশা করছি।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু মনে করিয়ে দিল, আমি তাঁর চেয়ে ১৮ বছরের বড়। জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণের ক্ষেত্রে বয়সের পার্থক্য কোনো সমস্যা নয়। কেবল দেখতে হবে, মন সজীব এবং সক্রিয় আছে কি না। আমার মনে হয় ৭৬ বছরের নিরঞ্জন হালদার এবং ৫৮ বছরের অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে একই ধরনের চিন্তা আছড়ে পড়ত। তাই উৎস মানুষ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সম্পাদকের সঙ্গে আমার পরিচয় ও বন্ধুত্ব। আমি অন্যত্র বলেছি, স্টলে উৎস মানুষ দেখে পত্রিকাটি কিনেছি এবং মনে মনে ভেবেছি, এমন একটি পত্রিকা তো আমারও পত্রিকা। আমি এই ধরনের পত্রিকাই তো চাই। পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যার বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধের জন্য আমি স্টল থেকে পত্রিকা কিনে বিশেষ বিশেষ পরিচিতি জনকে পাঠাতাম। তাতেই অনেকে বলতে শুরু করেন, উৎস মানুষ তো নিরঞ্জনবাবুদের পত্রিকা। রমানাথ মজুমদার স্ট্রিটে উৎস মানুষের দোকান হওয়ার পর বই কিনতে যেতাম। ভাস্কর একদিন বলেছিলেন গ্রাহক হতে। আমার জবাব ছিল, সকলেই গ্রাহক হলে স্টল থেকে পত্রিকা কেনার লোক থাকবে না। এবং তখন স্টলে পত্রিকাও রাখবে না।

উৎস মানুষ ছাপা শুরু হয়েছিল বাঙালি পাঠকদের বিজ্ঞানমনস্ক করে নানারকম কু-সংস্কার থেকে সমাজকে মুক্ত করতে। অন্তত আমার তাই ধারণা। নানারকম অলৌকিকের ভেলকি, ঐতিহ্য বনে যাওয়া কুসংস্কার, পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির আড়ালে লুকিয়ে থাকা ধাপ্পা, নদীর জল বা পুকুরের জলের মাহাত্ম্য নিয়ে চালু কুসংস্কার। আগে কোলকাতার পুরোগামী-র পাঠকেরা র‍্যাশনালিস্ট কাভুরের নাম জানতেন। ভবানী সাহু এবং কাভুরের লেখা ও কুসংস্কার বিরোধী কাজকর্ম উৎস মানুষের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি তরুণ সমাজ জানতে পেরেছিল। এমন একটা উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছিল বলেই কেরল/তামিলনাড়ু থেকে এখানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ম্যাজিকের সাহায্যে অলৌকিকতার মুখোশ ও ধাপ্পা লোকের কাছে তুলে ধরা গিয়েছিল। উৎস মানুষ প্রকাশের পর পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে ওঠে। সেই সময়ে কত ছাত্র ও যুবক উৎস মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল? তার মাত্র দুটি উদাহরণ দিতে চাই। একবার শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় একদল ছাত্র পত্রিকা ও বই বিক্রি করতে গিয়েছিল। আমার ছেলে শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসে বলল, শ্যামলী মাসির বাড়িতে ঐ সময়ে যারা ছিল তারা তোমাকে চেনে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কি উৎস মানুষ নিয়ে গিয়েছিল? জবাব দিল, হ্যাঁ। ১৯৮৪ সালের৩ ডিসেম্বর ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন রাজ্যের তরুণ ডাক্তাররা গিয়ে চিকিৎসা করেছিল। আমি দু-মাস পরে স্বেচ্ছাসেবী সেই ডাক্তারদের অফিসে যেতেই কয়েকজন জানাল, তারা আমাকে চেনে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা কি উৎস মানুষের সঙ্গে আছো? তারা বলল, হ্যাঁ।

অশোকবাবুর বাড়ি ছিল পত্রিকার অফিস। তিনি একাধারে সম্পাদক, করণিক, হিসাবরক্ষক, সার্কুলেশন ম্যানেজার এবং পত্রিকা ডাকে দেওয়ার মানুষ। তাঁর বাড়ি প্রেস থেকে পত্রিকা এনে রাখার জায়গা। পুস্তক প্রকাশনার ও বই বিক্রির জন্য ভাড়া নেওয়া হল রমানাথ মজুমদার স্ট্রিটের একটি ঘর। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সময় থেকে সেই দোকান আমাদের নিয়মিত আড্ডার জায়গা। ৬টার সময় পত্রিকার পয়সায় চা-মুড়ি খাওয়া। সেই সঙ্গে সম্পাদকমণ্ডলী ও ব্যবসায়িক আলোচনা। এখানে দুপুরে এলে দেখতে পেতাম দোকানের দায়িত্বে থাকা ভদ্রমহিলা অন্যান্য বইয়ের অর্ডার অনুসারে বই পাঠাচ্ছেন।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগী হয়ে যে কাজ শুরু করেছিলেন, সেই কাজ আমাদের নতুন করে আরম্ভ করতে হবে। উৎস মানুষের প্রথম সংখ্যা থেকে যাঁরা পত্রিকা বাঁধিয়ে রেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই অশোকবাবুর অসমাপ্ত কাজে হাত লাগাবেন। অশোকবাবুকে স্মৃতি হিসেবে নয় উৎস মানুষ পত্রিকার একজন প্রেরণাদাতা হিসেবে অনুভব করতে চাই।

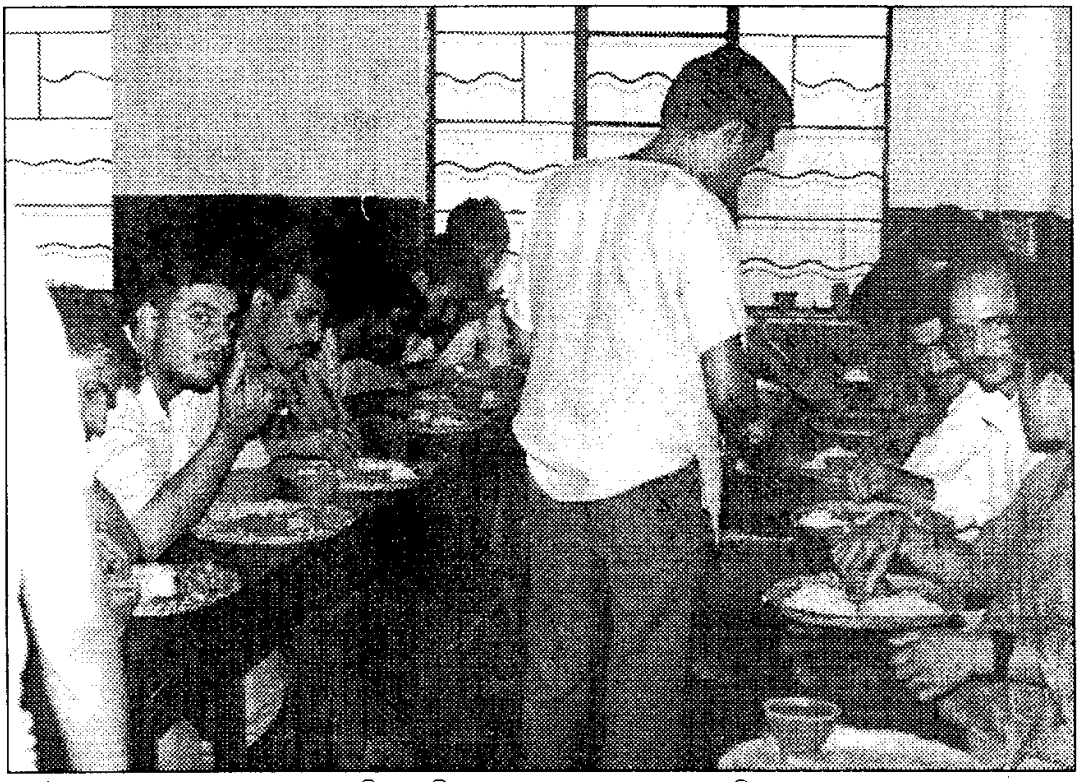

উৎস মানুষের আড্ডা ১৯৯৩। রানী ভবানী স্কুলে দুপুরে সবার সঙ্গে পঙ্‌ক্তিভোজে সকলের সঙ্গে অশোকদা

অভিমন্যুর মৃত্যু ও খানিক স্বস্তি

সমীরকুমার ঘোষ

খবরটা একটু দেরিতেই পেয়েছিলাম। অশোকদা তখন নার্সিংহোম সফরের শেষ পর্বে। ভেন্টিলেশনে। এ এক অদ্ভুত খেঁচাকল, মৃত লোকের শ্বাস-প্রশ্বাস দেখিয়ে রোগীর আত্মীয় পরিজনদের পকেটেও পর্যাপ্ত হাওয়া খেলার অবকাশ করে দিতে পারে। জানতাম চিকিৎসা-ব্যবসার এই খেলার কথা। অশোকদা বেঁচে নেই জেনেও দেখতে গেলাম। অনেক রোগী ও তাঁদের পরিজনদের হট্টমালার দেশে এক কোণে পড়ে আছে অশোকদা। নিঃসঙ্গ। যেন কুরুক্ষেত্রে অভিমন্যু। আমাদের নানা স্তোকবাক্যে উৎস মানুষের চক্রব্যূহে প্রবেশ করেছিল। বেচারা এত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়বে কি করে!

অশোকদার পাশটিতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। একা। 'হারামি, তোর এই আসার সময়! ঝোলানো স্বভাবটা গেল না!' —বলে উঠল না। সে তখন গভীর প্রশান্তির ঘুমে। মুখে যন্ত্রণার লেশ নেই। বন্ধু, অতি প্রিয়জন হারানোর দুঃখটা বুকের ভেতর মোচড় দিতে লাগল। মনে স্মৃতির ডিভিডি-তে তখন হাইস্পিড রিওয়াইন্ডিং চলছে। ২৫-২৬ বছরের সম্পর্কের গোড়ার দিকে চলেছি।

সেটা ১৯৮১ বা ৮২। আমি বইপাগল। বইমেলায় হাতড়াচ্ছি, একজন দুটো পুস্তিকা এগিয়ে দিল—মালা বাড়ে রোগ সারে ও শালগ্রাম শিলার বিজ্ঞান রহস্য। বেশ কৌতূহল হল। ছেলেটি বলল, ওই তো অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁড়িয়ে। দেখলাম ফর্সা, সুদর্শন এক ভদ্রলোক একজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। কথা বলা ঠিক সাহসে কুলোল না। বন্ধু অচিন্ত্য ওরফে মদন নিয়ে গেল কার্তিক বোস স্ট্রিটের ঘুঁজিতে, নিবারণদার বাঁধাইঘরে। সেই গুটিগুটি আসা-যাওয়ার শুরু। বিডন স্ট্রিটের প্রথম আড্ডাতেও গেলাম। যৌবনের স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা নিকটতর করতে লাগল মানুষগুলোর, পত্রিকার। আমি তখন বিজ্ঞানের স্নাতক মাত্র। আর ওরা কেউ বিজ্ঞানী, কেউ অধ্যাপক। আমার অবস্থা বকো মধ্যে হংস যথা। ওরা কথা বলে, তর্ক লড়ে, আমি হাঁ করে এর-ওর মুখের দিকে তাকাই, কথা গিলি। সাপ্তাহিক আলোচনা বা মাসিক আড্ডায় কোনো বিষয়ে আমার মতামত চাইলে ভয়ঙ্কর বিব্রত হই। তুলনায় ভাস্করদার সঙ্গে সহজে মিশতাম অশোকদার সঙ্গে মিশতাম আলগোছে। জানতাম

অশোক-ভাস্কর দুই ভাই। ৮৪-র নভেম্বরে জ্যোতিষবিরোধী দীর্ঘ ছড়া 'বেকারত্ব নিবারণী পাঁচন' ছাপা হল। উৎস মানুষে সম্ভবত সেটাই প্রথম ছড়া। মনে হল জাতে উঠলাম। নিজেকে পত্রিকার একজন ভাবতে লাগলাম। অশোকদা ভাস্করদাকে বলল, 'ও শালা বেকার, ওকে কিছু সাম্মানিক দে! এমনই ছিল অশোকদার ভালবাসার সম্ভাষণ। আমার আপত্তি টিকল না। ৫০ টাকা পেয়েছিলাম।

পত্রিকার উত্থান-পতন চোখের সামনেই। মাঝ নব্বই দশক থেকে বন্ধুরা গঙ্গারামবাবু (গঙ্গা ভীষ্মকে জন্ম দিয়ে কেটে পড়েন) হতে লাগল। নিবারণদার ঘর বা রমানাথ মজুমদার স্ট্রিটের ঘরে উপচে পড়া ভিড়, বিভিন্ন জনের বাড়িতে তুমুল তর্ক তোলা মাসিক বৈঠক হয়ে গেল ইতিহাস। শিবরাত্রির সলতে হিসাবে রয়ে গেলাম দু-একজন। এই সময়টা অশোকদা অনেকটা নির্ভর করত আমার ওপর। আমরা হয়ে উঠলাম দারুণ বন্ধু। আমি যেমন দেশলাই খোল যোগার করে ওকে জমানোয় মদত দিয়েছি, অশোকদাও আকাশবাণী থেকে আনা 'তাহার নামটি রঞ্জনা' নাটকটা আমায় দিয়েছে। দুজনে বালক ব্রহ্মচারীর মৃতদেহ দেখতে গিয়ে বিপদেও পড়েছি। শুধু উৎস মানুষ নয়, পরিবারিক সমস্যা নিয়েও কথা হত। শেষের দিকে ফ্ল্যাট কিনতে গিয়ে কীভাবে ঋণে জর্জর সে কথাও বলত। পরকীয়া নিয়ে একে অপরকে বিস্তর গালগপ্পোও শোনাতাম। ওসব ছিল মুখেই। বাস্তবে মিত্রাদির সতীন ছিল উৎস মানুষ।

পুরনোরা তো গেলই, নতুন ছেলেপুলে আসাও বন্ধ। পত্রিকার প্রচার সংখ্যা কমতে লাগল। লেখার লোক, ভাল লেখায় আকাল দেখা দিল। সি আই এ-র টাকাগুলো যদি সে সময় সত্যিই পাওয়া যেত! (এক আগমার্কা যুক্তিবাদী নেতার মুখে শুনেছিলাম উৎস মানুষ সি আই এ-র টাকায় চলে)। অসহায় অশোকদা হাতের কাছে যাকে পায় আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে। তাদের অনেকে ধান্দাবাজ, প্রায়-ধান্দাবাজ হওয়া সত্ত্বেও। এমন পত্রিকা ও বই প্রকাশ পায়, যার মান উৎস মানুষের সঙ্গে খাপ খায় না। নিজেদের পরিবারের লোকেদেরই তো উদ্বুদ্ধ করতে পারলাম না— পত্রিকা প্রকাশ করে আর লাভ কি! বাস্তব পরিস্থিতি বুঝিয়ে পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দিতে বলতাম। যুক্তিগুলো মানত কিন্তু পত্রিকার সঙ্গে এতটাই একাত্ম হয়ে গিয়েছিল নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার ভয় পেত। মরিয়া হয়ে বলত, সব ছেড়ে দিলে বাঁচব কী নিয়ে! আমাদের তো কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই! সমমনা, ধান্দাবাজি না-করা কিছু মানুষ তো পত্রিকার দৌলতেই কাছাকাছি থাকতে পারি!

অশোকদার প্রয়াণের পর অনেকের বাষ্প বিসর্জনে আর্দ্রতা প্রতিদিন রেকর্ড গড়ছে। অশোকদা মহান, উৎস মানুষ মহতী উদ্‌যোগ—গঙ্গারামবাবুরাও একবাক্য। তবু কোন মহোত্তর কাজ তাঁদের সরিয়ে নিয়েছিল কে জানে! বাইরের লোকের ক্রমাগত গ্যাস খেয়ে 'আমিই উৎস মানুষ' এই ধারণাটা প্রায় নিঃসঙ্গ অশোকদা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। নামহীন সম্পাদকমণ্ডলী থেকে জন্ম হয়েছিল 'সম্পাদক: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর। তা সত্ত্বেও অশোকদার দ্বিচারিতা ছিল না। পত্রিকার প্রতি ভালবাসা, মূল্যবোধ ছিল নিখাদ। সর্বোপরি ছিল এক অনুভূতিপ্রবণ ভাল মানুষ।

চিরঘুমে শায়িত অশোকদা। সামনে একা আমি স্মৃতিভার নিয়ে। স্ত্রী-কন্যাকে সময় দিতে পারেনি যে উৎস মানুষ-এর জন্য তার থেকে পেয়েছে শুধুই ফাঁকি, হতাশা, আঘাত, যন্ত্রণা। এবার সব থেকে মুক্ত। বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষতি-অক্ষতি জানি না। মানুষকে বিশ্বাস করা, সমাজ বদলানোর স্বপ্ন দেখা, বোকা মানুষটা প্রতিদিনের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হল, এই ভাবছি আর আমার সমস্ত দুঃখ চলে যাচ্ছে। বেশ স্বস্তি পাচ্ছি। মনে পড়ছে সেই লাইনগুলো—

কেন্দ্রস্থলে অভিমন্যু, শরের শয্যায়,—
সিদ্ধকাম মহাশিশু! ক্ষত কলেবর
রক্তজবাসমাদৃত; সস্মিত বদন...
—সন্ধ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র উজ্জ্বল
নিদ্রা যাইতেছে সুখে।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিভিন্ন সংগঠন নানান অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।
বেশ কিছু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাকে নিয়ে লেখা :

১। বই চিত্র - সভা - ২২ নভেম্বর ২০০৮
২। উৎস মানুষের স্মরণসভা, স্টুডেন্টস হলে ২৯ নভেম্বর ২০০৮
৩। চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা
৪। বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চ —মছলন্দপুর, ২৫ জানুয়ারি ২০০৯
৫। হাতিবাগানে চেতনা-র বিজ্ঞান মেলায় ৩০ ডিসেম্বর ২০০৮
৬। লিটল ম্যাগাজিন সমন্বয় মঞ্চ আয়োজিত লিটল ম্যাগাজিন মেলায় প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে ৩ জানুয়ারি ২০০৯। আলোচনা মঞ্চটি ছিল অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে।

১। PSYCHE AND SOCIETY– PAVLOV INSTITUTE PUBLICATION DECEMBER 2008 ISSUE
২। মানব মন — জানুয়ারী ২০০৯ সংখ্যা
৩। বাংলা দেশ থেকে প্রকাশিত গণস্বাস্থ্য - বিভিন্ন লেখক